بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"কালেমা তৈয়্যেবা"য় বলা হয়েছে-

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্"

এই কালেমাতে আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে 'ইলাহ্' বলে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পরিচয় দেয়া হয়েছে "আল্লাহর রাসুল" বলে। এখন জানতে হবে- "ইলাহ্" শব্দের অর্থ কী? "রাসুল" শব্দের অর্থ কী?

প্রথম অধ্যায় ঃ

ইলাহ্

ইলাহ্ শব্দের মূলধাতু কি? উলুহিয়ত -এর ভিত্তি কিসের উপর? ইলাহ্ বা মা'বুদের একক বৈশিষ্ট কি?

"ইলাহ্" শব্দটি ঐশীবানী। কালেমা তৈয়্যেবা বা ঈমানের মূলমন্ত্র হলো তাওহীদ ও রিসালাত। অর্থাৎ- "উলুহিয়ত ও রিসালাত" -এই দু'টি শব্দ হচ্ছে ইসলামের মৌলিক দর্শন। তাই "ইলাহ্ ও রাসুল" সম্পর্কে মৌলিক এবং সঠিক ধারনা না থাকলে যেকোন মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যেতে পারে। এই "ইলাহ্ ও রাসুল" নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। ব্যাখ্যারও অন্ত নেই। ইসলামী চিন্তাবিদ নামে পরিচয় দানকারীরা নিজেদের মনের মাধূরী মিশিয়ে ইচ্ছামত তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই "ইলাহ্" ও "রাসুল" -এর ব্যাখ্যায় নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে- দেখা দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ। এই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও মতবাদ দাঁড় করানোর কারণেই মুসলমানদের মধ্যে নিত্য নূতন ফের্কার সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। ফলে সরলপ্রাণ মুসলমানরা বিভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে পছন্দমত বিভিন্ন গ্রুপে বা ফের্কার ফাঁদে পড়ে বিভ্রান্ত ও বিপদগামী হচ্ছে। "ইলাহ্ ও রাসুল" সম্পর্কে

www.sunnibarta.com

যদি এক ও অভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া হতো- তাহলে এই নব্য ফিত্নার সৃষ্টি হতো না।

<u>প্রশ্ন জাগে-</u> তাহলে অতীতে কি কোন একক ও সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি? অবশ্যই দেয়া হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে ইসলামী দর্শনের ইমামগণ গ্রন্থও রচনা করে গেছেন। ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহঃ) ও ইমাম আবুল মনসুর মাতুরিদী (রহঃ) হলেন চার মাযহাবের স্বীকৃত আকায়েদের ইমাম। তাঁদের প্রণীত নীতিমালা ও ব্যাখ্যাই সঠিক ও নির্ভূল বলে স্বীকৃতি পেয়েছে- মুসলিম জাহানে। তাঁদের অনুসরণ করেই পরবর্তী আকায়েদের ইমাম ও বিশেষজ্ঞগণ আকায়েদের গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু ইদানিংকালে সঠিক ইসলামী জ্ঞানহীন কিছু উচ্চাকাঙ্খী বিপদগামী লোক মাযহাব ও তাকলীদকে অস্বীকার করে নিজেরাই ইসলামের ও কোরআন হাদীসের মনগড়া অপব্যাখ্যা তৈরী করে সরলমনা মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করছে এবং নূতন জামাত সৃষ্টি করছে। তারা "ইলাহ্" শব্দের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে পূর্বের ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছে। তারা ইমাম মানেনা, তাকলীদ মানেনা, মাযহাব মানেনা, এমনকি ইসলামের একক দর্শন এবং ব্যাখ্যাও মানেনা।

তাই "ইলাহ্" সম্পর্কে তাদের অপব্যাখ্যা প্রথমে আলোচনা করে তার কুফল ও অসারতা প্রমাণ করে তারপর সঠিক ও একক ব্যাখ্যা আলোচনা করা হবে- ইন্শা-আল্লাহ।

<u>এই তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে "ইলাহ্" বলা হয় একমাত্র ঐ পবিত্র সত্ত্বাকে-</u>

১। যিনি গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় জানেন।

২। যিনি সৃষ্টিতে একমাত্র নির্দেশদাতা।

৩। যিনি একমাত্র আরোগ্য দানকারী।

৪। যিনি একমাত্র সন্তান দানকারী।

৫। যিনি দূর থেকে শুনেন ও দেখেন।

৬। যিনি সর্বত্র হাযির ও নাযির।

www.sunnibarta.com

৭। যিনি মুশকিলকুশা বা বিপদ দূরকারী।

৮। যিনি একমাত্র হাজত রাওয়া বা মনোবাসনা পূর্ণকারী।

৯। যিনি অভিযোগ শ্রবণকারী ও একমাত্র সাহায্যকারী।

১০। যিনি সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও চিরস্থায়ী।

তাদের মতে "ইলাহ্" হওয়ার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলো হলো মাপকাঠি। তাদের মতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানেন না, অন্য কেউ মুশকিলকুশা হতে পারেন না, অন্য কেউ মনোবাসনা পূরণ করতে পারেন না, অন্য কেউ সাহায্য করতে পারেন না, অন্য কেউ দূর থেকে শুনেন না এবং দেখেন না, অন্য কেউ হাযির হতে পারেন না- ইত্যাদি। তাদের মতে অন্য কাউকে উল্লেখিত গুণের অধিকারী মান্য করলে তাদের মতে শির্ক হবে এবং এই আক্বিদা পোষণকারীরা মুশরিকে পরিণত হবে। তাদের মতে এইসব গুণাবলীর অধিকারীই "ইলাহ্"। অন্য কাউকে মান্য করলে তাকে "ইলাহ্" বানানো হয়- ইত্যাদি।

বিঃদ্রঃ- তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- নবী, ওলী ও গাউস কুতুবগণের মোজিযা ও কারামতকে অস্বীকার করা এবং মোজিযা ও কারামতে বিশ্বাসী মুসলমানদেরকে মুশরিক বলে আখ্যায়িত করা।

এবার আমরা তাদের ভ্রান্ত ধারনা খন্ডন করার জন্য উক্ত ১০টি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখাবো যে, তারা "ইলাহ্" শব্দের যে সংজ্ঞা দিয়েছে- তা সঠিক নয়। তাদের সংজ্ঞা মেনে নিলে লক্ষ লক্ষ "ইলাহ্" প্রমাণিত হবে। তখন এক আল্লাহ আর "ইলাহ্" থাকবে না -বরং লক্ষ লক্ষ "ইলাহ্" হয়ে যাবে। তখন তাওহীদের উপরই আসবে বিরাট আঘাত।

১। প্রসঙ্গ ঃ গায়েব জানা

যারা বলেন- "ইলাহ্ তিনি- যিনি গায়েব জানেন" -তাদের কথা সত্য হলে বলতে হয়- উলুহিয়াতের ভিত্তি হচ্ছে ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান। তাদের সংজ্ঞা মতে- তখন অনেক ইলাহ্ সাব্যস্থ হয়ে যাবে। যেমন- হযরত

www.sunnibarta.com

ঈছা আলাইহিস সালাম, হযরত খিযির আলাইহিস সালাম, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম- তাঁদের সবারই আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলমে গায়েব ছিল। হযরত ঈছা আলাইহিস সালামের ইলমে গায়ব ছিল মানুষের খাদ্য ও সংরক্ষিত মালামাল সম্পর্কে -যা কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত। হযরত খিযির আলাইহিস সালামের ইলমে গায়ব বা ইলমে লাদুন্নী ছিল তিনটি বিষয়ে। তাও কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ইলমে গায়ব ছিল- মানুষের ঈমান ও কুফর বিষয়ে- কে ঈমান আনবে, কে আন্‌বেনা- সে বিষয়ে। ইহাও কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত। তাহলে তাঁরা কি ইলাহ্ বা মা'বুদ ছিলেন? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু ইলমে গায়বকে ইলাহ্ হওয়ার মাপকাঠি সাব্যস্থকারীদের সংজ্ঞা অনুযায়ী তারা ইলাহ্ প্রমাণিত হন। এখন আমরা প্রমাণ করবো- উক্ত তিনজন নবীর ইলমে গায়ব কোরআন মজিদের কোন্ কোন্ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

ক) হযরত ঈছা আলাইহিস সালামের ইলমে গায়বঃ

আল্লাহ পাক হযরত ঈছা আলাইহিস সালামের ইলমে গায়েবের স্বীকৃতি দিয়ে এরশাদ করেন-

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَاتَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ-

অর্থাৎ- "হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম তাঁর কওমকে লক্ষ্য করে বললেন- "তোমরা তোমাদের ঘরে কি কি খাচ্ছ এবং কি কি জিনিস জমা করে রাখছো- তা আমি না দেখেই তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নম্বর ৪৯)।

অত্র আয়াতে- বর্তমানে তারা কি খাচ্ছে, ভবিষ্যতে কি খাবে এবং বর্তমানে কি কি জিনিস জমা করছে, ভবিষ্যতে কি কি জমা করে রাখবে- তা তিনি না দেখেই বলে দিতেন। প্রথম শব্দটির মূলধাতু হলো نَبَاءٌ অর্থাৎ- অদৃশ্য সংবাদ। ইহা ছিল হযরত ঈছা আলাইহিস সালামের খাদ্য সংক্রান্ত ইলমে গায়েব -যার স্বীকৃতি দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। যদি গায়েব বা অদৃশ্য জানা

www.sunnibarta.com

"ইলাহ্" হওয়ার ভিত্তি বা বৈশিষ্ট হয়- তাহলে ঈছা (আঃ) ইলাহ্ সাব্যস্থ হন। বুঝা গেল- ইলাহ্ সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা সঠিক নয় এবং এর উপর ভিত্তি করে কোন নবীর ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় জানাকে শির্ক বলাও সঠিক নয়।

খ) হযরত খিযির আলাইহিস সালামের ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে গায়বঃ

আল্লাহ পাক সূরা কাহাফ -এর শেষাংশে হযরত মূছা আলাইহিস সালাম ও হযরত খিযির আলাইহিস সালামের তিনটি ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন- যার সারমর্ম হচ্ছে- "আল্লাহ পাক যখন হযরত মূছা আলাইহিস সালামকে জানালেন যে, আমার এক বিশেষ বান্দাকে (খিযির) ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে আছরার (গোপন রহস্য) দ্বারা আমি ভূষিত করেছি। তখন মূছা আলাইহিস সালামের ইচ্ছা জাগলো তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার। আল্লাহ্ পাক বলে দিলেন- দুই নদীর সঙ্গমস্থলে উক্ত বান্দার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। আর উক্ত দুই নদীর মোহনা হলো ঐ জায়গায়- যেখানে ভুনা মাছ জীবিত হয়ে যায়। হযরত মূছা আলাইহিস সালাম নিজ খাদেম ইউশা আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে মাছ ভুনা করে হযরত খিযিরের সন্ধানে বের হলেন। মিশর ও ফিলিস্তিনের এলাকায় দুই নদীর মোহনায় তাঁর ভুনা মাছ জীবিত হয়ে নদীতে চলে যায়। হযরত মূছা (আঃ) মাছের গমনের রাস্তা অনুসরণ করে নদীর পানে গিয়ে দেখলেন- হযরত খিযির আলাইহিস সালাম পানির উপর শুয়ে আছেন। পরিচয় হওয়ার পর দুই নবী একসাথে চলতে লাগলেন। কোন এক নদী পার হওয়ার জন্য তাঁরা উভয়ে এক মাঝির নৌকায় আরোহন করলেন। মাঝ নদীতে আসার পর হযরত খিযির (আঃ) নূতন নৌকাটির তলা ছিদ্র করে দিলেন। এর রহস্য বুঝতে না পেরে হযরত মূছা (আঃ) হযরত খিযির (আঃ) -এর কাজে আপত্তি করলেন।

পরবর্তী ঘটনা ছিল- এক খোলা মাঠে কতিপয় ছেলে খেলাধূলায় মেতে উঠেছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও বুদ্ধিমান ছেলেটিকে হযরত

www.sunnibarta.com

খিযির (আঃ) লাঠির আঘাতে মেরে ফেললেন বিনা অপরাধে। এবারও হযরত মূছা (আঃ) রহস্য বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে বসলেন। হযরত খিযির (আঃ) তাঁকে বিদায় করে দিতে চাইলে তিনি বললেন- আবার যদি প্রশ্ন করি- তাহলে আমাকে বিদায় করে দিবেন। অতঃপর তাঁরা চলতে চলতে এক পল্লীতে গিয়ে রাত্রি যাপনের জন্য পল্লীবাসীকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু পল্লীবাসীরা তাঁদেরকে স্থান দিলো না।

হযরত খিযির (আঃ) ঐ গ্রামেরই একটি ভাঙ্গা দেওয়াল ঠিক করার জন্য হযরত মূছা (আঃ) কে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানালেন। হযরত মূছা (আঃ) এবার আর ধৈর্য ধারন করতে পারলেন না এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলেন। হযরত খিযির (আঃ) বললেন- এবার আপনাকে বিদায় দিলাম। আপনি আমার কর্মকান্ডের ব্যাপারে প্রশ্ন করছেন এর অন্তর্নিহিত গোপন রহস্য না জানার কারণে। তখন তিনি তিনটি ঘটনার গোপন রহস্য খুলে বললেন এবং মুছা আলাইহিস সালামকে বিদায় দিলেন।

হযরত মূছা (আঃ) একজন নবী হয়েও উক্ত গোপন এলেম সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সমস্ত মোফাস্‌সেরীন বলেছেন- হযরত খিযির (আঃ) -এর উক্ত এলেম ছিল ইলমে গায়ব বা ইল্‌মে লাদুন্নী- যা মূছা (আঃ) কে দান করা হয়নি।

যারা বলেন- "ইলাহ্" তিনি- যিনি গায়েব জানেন"- তাদের মতানুযায়ী হযরত খিযির (আঃ) ও ইলাহ্ সাব্যস্থ হয়ে যান। (নাউযুবিল্লাহ)।

বুঝা গেল- ইলমে গায়েব ইলাহ্ হওয়ার মাপকাঠি নয়। কেননা, তাহলে একাধিক ইলাহ্ মানতে হবে- যা কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

গ) হযরত নূহ আলাইহিস সালাম -এর ইলমে গায়ব ঃ

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম দীর্ঘকাল হেদায়াত করে মাত্র ৭২ জনকে মু'মিন বানিয়েছিলেন। তাঁর হেদায়াতে অন্যরা কান দেয়নি। অবশেষে তিনি আল্লাহর কাছে ঐসব কাফেরদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রার্থনা

www.sunnibarta.com

জানালেন এবং বললেন-

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا- اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَايَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا-

"হে আমার রব! এই পৃথিবীর বুকে কাফিরদের কোন জনপদকেই আর রেহাই দিওনা। কেননা, তাদেরকে রেহাই দিলে তারা তোমার নেক বান্দাদেরকে গোমরাহ্ করে ফেলবে এবং তাদের বংশে ভবিষ্যতে কাফের ফাজের ছাড়া আর কিছুই পয়দা হবেনা"। (সূরা নূহ, আয়াত ২৬)।

উক্ত আয়াতে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বলে দিলেন- **ভবিষ্যতে তাদের বংশে আর কোন মো'মেন সন্তান পয়দা হবেনা। এটাই তো ইলমে গায়ব।** আল্লাহ পাক এই ইলমে গায়ব হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে দান করেছেন। যারা বলে- "যিনি গায়েব জানেন তিনিই ইলাহ্"। তাহলে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তো ইলাহ্ সাব্যস্থ হয়ে যান। (নাউযুবিল্লাহ্)।

বুঝা গেল- ইলমে গায়ব জানাই শুধু ইলাহ্ হওয়ার মাপকাঠি নয়।

২। প্রসঙ্গ ঃ সৃষ্টিতে নির্দেশ জারী করার ক্ষমতা ঃ

যারা বলে- "সৃষ্টিতে নির্দেশ জারী করেন যিনি- তিনি ইলাহ্"। পানি, চাঁদ, সুরুয- ইত্যাদির উপর নির্দেশ চালান ইলাহ্। তাহলে তাদের সংজ্ঞানুযায়ী বলতে হয়- হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামকে "ইলাহ্" মানতে হবে। কেননা, তাঁর নির্দেশে বায়ূ চলাচল করতো। তিনি বায়ুর উপর নির্দেশ জারী করতেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ-

অর্থাৎ- "আমি (আল্লাহ) বায়ূকে সোলায়মানের অধীনস্থ করে দিয়েছি। **তাঁর নির্দেশে যেখানে ইচ্ছা বায়ূ অবাধে চলাচল করে"।** (সূরা ছোয়াদ,

www.sunnibarta.com

আয়াত ৩৬) তিনি আরো এরশাদ করেন-

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ-

অর্থাৎ- "আমি তীব্র গতির বায়ূকে সোলায়মানের অধীনস্থ করে দিয়েছে- যা তাঁর নির্দেশে প্রবাহিত হতো"। (সূরা ... আয়াত ...)।

উক্ত দুইটি আয়াতে পরিস্কার করে বলা হয়েছে- হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম -এর নির্দেশে স্বাভাবিক বায়ূ ও তীব্র বায়ূ চলাচল করতো। এই বায়ূকে বশ করেই তিনি সকাল সন্ধ্যায় সিংহাসনে আরোহন করে বায়ূর উপর দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে সুদূর ইয়ামেনের সাবা শহরে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করতেন স্ত্রী বিলকিসের সাথে সাক্ষাতের জন্য।

যে বায়ূর গতির উপর বৃষ্টি ও ফসল উৎপাদন নির্ভরশীল, **সেই বায়ূর উপর নির্দেশ জারী করতেন হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম**। যদি সৃষ্টিতে নির্দেশ জারীই "ইলাহ্" হওয়ার ভিত্তি হয়- তাহলে হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামকেও "ইলাহ্" মানতে হবে। ইহা কি বিরুদ্ধবাদীরা স্বীকার করতে রাজী আছেন?

তাহলে বুঝা গেলো- তাদের ইলাহ্ সম্পর্কীত ব্যাখ্যাটিই ভুল।

৩। প্রসঙ্গ ঃ আরোগ্য দান করা ও জীবিত করা ঃ

ক) আরোগ্য দান করা মুলতঃ আল্লাহর কাজ- এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যারা বলে- "তিনিই ইলাহ্- যিনি আরোগ্য দান করেন"। তাদের এই সংজ্ঞা সঠিক হলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ইলাহ্ মানতে হয়। (নাউযুবিল্লাহ)।

কেননা, তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য ৪০ বৎসর পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। অবশেষে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আপন গায়ের জামা ভাইদের কাছে দিয়ে বলেছিলেন-

www.sunnibarta.com

اِذْ هَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَأْتِ بَصِيْرًا-

অর্থাৎ- "তোমরা আমার এই জামা নিয়ে যাও- আমার পিতার চেহারার উপর তা দিয়ে আচ্ছাদন করো- এতেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন"। (সূরা ইউসুফ,আয়াত ৯৩)।

বুঝা গেলো- হযরত ইউসুফের জামার মধ্যে রোগ প্রতিশেধক ছিল। তাহলে পোষাক কি ইলাহ্ হয়ে গেলো?

খ) আল্লাহ পাক হযরত আইউব আলাইহিস সালামের রোগমুক্তির ব্যাপারে তাঁর পদাঘাতের পানিকে প্রতিশেধক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরশাদ হচ্ছে-

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ-

অর্থাৎ– "হে আইউব! তুমি আপন পা জমিনের উপর ঘর্ষণ করো। এতে প্রবাহিত পানি তোমার গোসল ও পান করার জন্য (রোগ মুক্তির জন্য) ব্যবস্থা করে দিলাম"। (সূরা ছোয়াদ, আয়াত ৪২)।

বুঝা গেল- হযরত আইউব আলাইহিস সালামের পদাঘাতে সৃষ্ট কুপের পানিতে রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্য পুনরোদ্ধারের তাছির বিদ্যমান ছিল। রোগ মুক্তির পানি কি তাহলে ইলাহ্"?

গ) হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করতেন এবং মৃতকে আল্লাহর নির্দেশে জীবিত করতে পারতেন। তিনি বলতেন-

وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ-

অর্থাৎ- "আমি আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান করি, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করি এবং মৃতকে জীবিত করি"। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৯)।

www.sunnibarta.com

এতে দেখা যাচ্ছে- হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কুষ্ঠরোগী ও জন্মান্ধকে আরোগ্য দান করতেন এবং মৃতকে জীবিত করতেন। এ কাজে অথরিটি ছিল আল্লাহর নির্দেশ এবং কাজটি ছিল হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম -এর। **আরোগ্যদান করা যদি ইলাহ্ বা আল্লাহ হওয়ার মাপকাঠি হয়- তাহলে হযরত ঈছা (আঃ) কেও "ইলাহ্" মানতে হয়-** অথচ তিনি ইলাহ্ ছিলেন না। প্রমাণিত হলো- বিরুদ্ধবাদীদের "ইলাহ্" সম্পর্কীত ব্যাখ্যাটিও সঠিক নয়।

ঘ) হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর আহ্বানে ৪টি মৃত পাখীর জীবন লাভ ঃ

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন- হাশরের দিনে কিভাবে মৃত প্রাণী পূণর্জীবিত হবে? আল্লাহ তা'য়ালা ৪টি পাখী কেটে টুকরা টুকরা করে পাহাড়ে নিক্ষেপ করার জন্য হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিয়ে পূনরায় তাদেরকে নাম ধরে ডাক দিতে বললেন। হযরত ইবরাহীমের ডাকে পাখীগুলো জীবিত হয়ে গেলো। **দেখা যাচ্ছে- তাঁর আহ্বানে মৃতরা জীবিত হয়েছে। তাহলে কি তিনি "ইলাহ্" বা আল্লাহ হয়ে গেছেন?**

অতএব, যারা বলে- "ইলাহ্" তিনিই- যিনি আরোগ্য দান করেন এবং মৃতকে জীবিত করেন"। -তাদের এই ব্যাখ্যা ভুল। তাদের ব্যাখ্যা মতে তো হযরত ঈছা, হযরত ইউসুফ, হযরত আইউব ও হযরত ইবরাহীম আলাইহিমুস সালামগণ ইলাহ সাব্যস্থ হন। (নাউযুবিল্লাহ)।

৪। প্রসঙ্গ ঃ সন্তান দান করা

যারা বলে- "ইলাহ্ তিনিই- যিনি সন্তান দান করেন- অন্য কারো এই ক্ষমতা নেই" -তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই-

হযরত মরিয়ম (আঃ) কুমারী ছিলেন। তিনি পর্দাঢাকা স্থানে গোসল করার সময় হযরত জিবরাইল (আঃ) মানব আকৃতিতে উপস্থিত হয়ে বললেন-

www.sunnibarta.com

إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا–

অর্থাৎ- "আমি আল্লাহর পক্ষ হতে বার্তা বহনকারী জিবরাইল। **আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করতে এসেছি"** (সূরা মরিয়ম, ১৯ আয়াত)

এই কথা বলেই বিবি মরিয়মের জামার আস্তিনে একটি ফুঁক দিলেন। তাতেই হযরত ঈছা রুহুল্লা পয়দা হলেন।

দেখুন- ছেলে মেয়ে দান করার মালিক আল্লাহ্। তিনি যাকে চান- শুধু কন্যা সন্তান দান করেন। যাকে চান- শুধু পুত্র সন্তান দান করেন। যাকে চান- তাকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন- কিছুই দেন না। এটা আল্লাহর একক কৌশল ও কুদরত। কিন্তু এই আয়াতে "সন্তান দান করা" হযরত জিবরাঈলের (আঃ) জন্য খাস করে ব্যবহার করা হয়েছে- আল্লাহর জন্য নয়। اَهَبَ ক্রিয়া পদের فَاعِلٌ বা কর্তা হচ্ছেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। "আমি তোমাকে পুত্র সন্তান দিব"। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বিবি মরিয়মকে পুত্র সন্তান দান করেছেন- একথা বলা কি শির্ক- বা এতে কি হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ বা "ইলাহ্" হয়ে গেলেন? **যদি সন্তান দান করাই ইলাহ্ হওয়ার ভিত্তি হয়- তাহলে তাদের সংজ্ঞা মতে হযরত জিবরাঈল (আঃ)ও ইলাহ্ সাব্যস্থ হয়ে যান।** এটা তো কোন মতেই মেনে নেয়া যায় না। বুঝা গেল- তাদের প্রদত্ত সংজ্ঞাটিই ভুল।

৫। প্রসঙ্গ ঃ দূর থেকে শুনা ও দেখা

যারা বলে- "ইলাহ্ তিনিই- যিনি দূর থেকে শুনেন ও দেখেন"। অর্থাৎ- ইলাহ্ বা আল্লাহ্ই একমাত্র দূর থেকে শুনেন ও দেখেন- অন্য কেউ নয়। তাদের এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে হযরত সোলায়মান (আঃ) ও হযরত ইয়াকুব (আঃ) কেও ইলাহ্ মানতে হয়। যেমন-

www.sunnibarta.com

ক) হযরত সোলায়মান (আঃ) সসৈন্যে কোথাও যাচ্ছিলেন। এক জঙ্গলে পিপিলিকার দল রাস্তা অতিক্রম করছিল। অনেক দূর থেকে হযরত সোলায়মান (আঃ) শুনতে পেলেন- পিঁপড়ার সর্দার বলছে-

يَا اَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَايَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ-

অর্থাৎ- "হে পিঁপড়ার দল! তোমরা তাড়াতাড়ি গর্তে ঢুকে পড়ো- যাতে সোলায়মান ও তাঁর সৈন্যদল তাঁদের অজান্তে তোমাদেরকে পিষে মেরে না ফেলে" (সূরা নমল, ১৮ আয়াত)।

হযরত সোলায়মান (আঃ) তিন মাইল দূর থেকে পিঁপড়া সর্দারের ঐ আওয়াজ শুনতে পেয়ে হেঁসে ফেললেন। দেখুন- পিঁপড়ার আওয়াজ শুনা ও বুঝা- তাও আবার তিন মাইল দূর থেকে- এটা অন্য কারো পক্ষেই শুনা সম্ভব নয়। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আঃ) শুনেছিলেন- যার সাক্ষ্য দিচ্ছে স্বয়ং কোরআন মজিদ। <u>দূর হতে শুনার কারণে কি হযরত সোলায়মান ইলাহ্ হয়ে গেছেন?</u>

খ) হযরত ইয়াকুব (আঃ) তৎকালীন কেনান- বর্তমান ফিলিস্তিন থেকে সুদূর মিশরে অবস্থানরত নিজ পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) কে দেখেছিলেন। যখন বিবি যোলায়খা হযরত ইউসুফ (আঃ) কে ফুঁসলাচ্ছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) যোলায়খার বদ্ধ ঘরে নিজ পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে দেখে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলেন। তিনি যোলায়খার যৌন অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য দৌঁড়ে পালাতে চেষ্টা করলেন- কিন্তু বিবি যোলায়খা পিছন থেকে দৌঁড়ে গিয়ে হযরত ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে টেনে ধরলেন। এতেও হযরত ইউসুফ (আঃ) কে আটকে রাখতে পারলেন না। অবশেষে নিজ নপুংসক স্বামী আযীয মিশরের কাছে ধরা পড়ে গেলেন। আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইউসুফ (আঃ) জন্মসূত্রে নিষ্পাপ ছিলেন। বিবি যোলায়খার হাজারো ফুঁসলানীতেও তাঁর পবিত্র চরিত্র অটল ছিল। তদুপরি- আপন পিতার গায়েবী উপস্থিতি দেখে তাঁর পবিত্রতার জোশ্ দ্বিগুন বেড়ে

www.sunnibarta.com

গেলো। **এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে- হযরত ইয়াকুব (আঃ) সুদূর কেনান থেকে আপন পুত্রকে কিভাবে দেখলেন এবং কিভাবে সেখানে উপস্থিত হলেন? দূর থেকে শুনা আর দেখা-ই যদি ইলাহ্ হওয়ার মাপকাঠি হয়- তাহলে হযরত ইয়াকুবকেও ইলাহ্ বলতে হয়।** বিরোধী পক্ষ কি মানতে রাজী আছেন? হক্বপন্থী সুন্নী মুসলমানরা তো কস্মিনকালেও তা মানতে পারেননা। তাহলে বুঝা গেল- দূর থেকে শুনলে ও দেখলেই ইলাহ্ হয়ে যায় না। অথচ বিরোধী পক্ষ তাই বলছে। **তাদের ব্যাখ্যা মেনে নিলে হযরত সোলায়মান ও হযরত ইয়াকুব (আঃ) কেও ইলাহ্ বলে স্বীকার করতে হয়- যা সুস্পষ্ট শির্ক। এই শির্কের মধ্যেই ডুবে আছে বিরোধী পক্ষ।**

৬। প্রসঙ্গ ঃ হাযির- নাযির

প্রত্যেক জায়গায় হাযির হওয়া বা বিরাজমান হওয়া এবং প্রত্যেক জায়গা হাতের তালুর ন্যায় দেখা যদি উলুহিয়াতের দলীল হয়- তাহলে অসংখ্য ইলাহ্ মেনে নেয়া অপরিহার্য্য হয়ে পড়বে। যেমনঃ-

ক) শয়তান পৃথিবীর সর্বত্র হাযির ও নাযির; কিন্তু সে ইলাহ্ নয়।

মানবজাতিকে গোমরাহ করার জন্য শয়তান একই মূহুর্তে পৃথিবীর সর্বত্র হাযির হওয়া ও প্রত্যেকের রক্তে মাংসে প্রবেশ করার জন্য এবং সমগ্র মানবজাতিকে একই সময় দেখার শক্তি আল্লাহর নিকট থেকে চেয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তাকে হাযির নাযির হওয়ার, ভিতরে প্রবেশ করার ক্ষমতা দান করেছেন। তাই বলে কি সে "ইলাহ্" হয়ে গেলো? সে তো নাপাক কাফের। সে তো দূরের কথা- হাযির-নাযির পবিত্র নবীগণও তো নিজেদেরকে "ইলাহ্" বলে দাবী করেন নি।

শয়তানের হাযির নাযির হওয়ার অকাট্য দলীল কোরআন মজিদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَاتَرَوْنَهُمْ–

www.sunnibarta.com

অর্থাৎ- "শয়তান ও তার বংশধরগণ তোমাদের (মানবজাতিকে) সকলকে এমন স্থান থেকে দেখে- যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা"। (সূরা আ'রাফ- আয়াত ২৭)।

একটি মাত্র শয়তান ছয়শ' কোটি মানব সন্তানের কলবে ওঁৎ পেতে বসে থাকে বলে হাদীস শরীফেও উল্লেখ আছে। রক্তের কণায়, শিরায় উপশিরায়- সর্বত্র সে একই সময়ে উপস্থিত হতে পারে এবং দূর থেকেও দেখতে পারে। তাহলে নবী করিম (দঃ) কে হাযির নাযির বললে ওহাবীদের নাক কপালে উঠে কেন? তিনি তো পাক- তাঁর ক্ষমতা তো আরো বেশী হওয়ার কথা। বুঝা গেল- সর্বত্র হাযির নাযির হওয়া ইলাহ্ হওয়ার মাপকাঠি নয়। যদি তাই হতো- তাহলে শয়তানও ইলাহ্ হতো। (নাউযুবিল্লাহ্)।

খ) মালাকুত মউত হযরত আযরাঈল (আঃ) প্রাণী জগতের সর্বত্র হাযির নাযির; অথচ "ইলাহ্" নন।

আল্লাহ পাক হযরত আযরাঈল আলাইহিস্ সালামকে প্রাণী জগতের সর্বত্র হাযির নাযির করে রেখেছেন। একই সময়ে তিনি লক্ষ কোটি প্রাণীর প্রাণ হরণ করেন। আল্লাহ পাক তার উপস্থিতি ও বিরাজমানতার কথা এভাবে ঘোষণা করেছেন-

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ-

অর্থাৎ- "তোমাদের প্রতি নিয়োজিত মালাকুল মউত (ফিরিস্তা) তোমাদের জান কব্জ করে"। (সূরা সাজ্দা, ১১ আয়াত) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْاَرْضَ لِمَلَكِ الْمَوْتِ كَالطَّشْتِ فِى الْيَدِ-

অর্থাৎ- "আল্লাহ তায়ালা সমগ্র পৃথিবীটাকে আযরাঈলের সামনে হাতের থালার মত করে রেখেছেন" (মিশকাত ও কুরতুবীর তাযকিরা)। অন্য এক

www.sunnibarta.com

হাদীসে আছে- আযরাঈল দিনে ৫বার প্রত্যেকের অবস্থা দেখে। প্রত্যেকের অবস্থা সম্পর্কে সে পুরাপরি জ্ঞাত। অর্থাৎ- তিনি পৃথিবীর সর্বস্থানে একই সময়ে হাযির ও নাযির। আযরাঈলের এ অবস্থা হলে আমাদের প্রিয় নবীর অবস্থা কী হতে পারে?

গ) আসিফ বিন বরখিয়া একই সময়ে সিরিয়া ও সাবা নগরীতে হাযির ও নাযির -অথচ ইলাহ্ নন।

হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামের উজির আসিফ বিন বরখিয়া এক মূহুর্তে চোখের পলক মারার চাইতেও কম সময়ের মধ্যে ইয়ামেন দেশের সাবা নগরীর রানী বিলকিসের সিংহাসন তুলে নিয়ে সিরিয়ায় বায়তুল মোকাদ্দাসে হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামের দরবারে পেশ করেছিলেন।

আসিফ বিন বরখিয়া দাবী করে বলেছিলেন-

قَالَ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ–

অর্থাৎ- "আমি রানী বিলকিসের সিংহাসনটি আপনার (সোলায়মান) চোখের পলক মারার পূর্বেই আপনার কাছে এনে দিতে সক্ষম" (সূরা নমল, আয়াত ৪০)।

অতএব, একই মুহুর্তে তিনি সিরিয়াতেও উপস্থিত, আবার সাবা নগরীতেও উপস্থিত। এটা ছিল তাঁর কারামত শক্তি। নবীগণের মোজেযা শক্তি তো আরো বেশী শক্তিমান ও ব্যাপক। নবীগণ- বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই মূহুর্তে কোটি কোটি মাইল দূরে একই সময়ে সর্বত্র হাযির ও নাযির হতে পারেন। এর ভুরি ভুরি বিশুদ্ধ প্রমাণ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান। তাই বলে কি তাঁরা ইলাহ্? যারা বলে- সর্বত্র হাযির নাযির হওয়া একমাত্র আল্লাহরই বৈশিষ্ট- তাহলে আসিফ বিন বরখিয়া, মালাকুত মউত- এমন কি খবিছ শয়তানকেও ইলাহ্ মানতে হবে। কেননা, তারাও তো একাধিক জায়গায় একসাথে হাযির

www.sunnibarta.com

নাযির। (নাউযুবিল্লাহ)।

তৌহিদপন্থী দাবীদাররা তাদের পুস্তকসমূহে- "ইলাহ্" শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা মানতে গেলে হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতার চেয়ে আরো বেশী "ইলাহ্" মানতে হবে। **প্রমাণিত হলো- নাযির নাযির হওয়াই "ইলাহ্" হওয়ার মূল ভিত্তি নয়।**

৭। প্রসঙ্গ ঃ বিপদ দূর করা, হাজত পূর্ণ করা ও সাহায্য করা

যারা বলে- "তিনিই ইলাহ্- যিনি অনুবিধা দূরকারী, হাজতপূরণকারী ও একমাত্র সাহায্যকারী"। তাদের এই সংজ্ঞা সঠিক নয়। আল্লাহ্ পাক তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা ও তাঁদের তাবাররুক বা বরকতময় বস্তুকেও ঐসব ক্ষমতা দান করেছেন। কোরআন মজিদে তার প্রমাণ রয়েছে। যেমনঃ

ক) বিবি মরিয়মের হাতের স্পর্শে মৃত খেজুর গাছ জীবিত হলোঃ

পবিত্রা কুমারী হযরত মরিয়ম (আঃ) আল্লাহর হুকুমে যখন গর্ভবতী হলেন এবং প্রসবকাল ঘনিয়ে আসলো- তখন তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের নিজস্ব হুজরা ও লোকালয় ত্যাগ করে অনেক দূরে বায়তুল লাহাম (বেথেলহাম) নামক জঙ্গলে চলে গেলেন। সেখানে না ছিল কোন সাহায্যকারীনী ধাত্রী, না ছিল কোন মহিলা। তিনি একাকিনী বসে বসে ভাবছেন আর মনে মনে বলছেন- "হায়! আমি যদি প্রসবের পূর্বেই মরে যেতাম, আমি যদি মানুষের স্মৃতিপট থেকে একেবারে মুছে যেতাম" (সূরা মরিয়ম)। তাঁর এই আহাজারীতে আল্লাহর রহমতের দরিয়া উথলে উঠলো। এমন সময় বিবি মরিয়ম একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

"তাঁর নীচে থেকে আওয়াজ আসলো- হে মরিয়ম! চিন্তা করো না, তোমার প্রতিপালক তোমার কদমের নীচে একটি শীতল প্রস্রবন সৃষ্টি করে দিয়েছেন"। (সূরা মরিয়ম)।

এখানে "কদমের নীচে" শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে- এই পানির ঝরনা বিবি মরিয়মের কদমের উছিলায় উৎপন্ন হয়েছে- যেমন যমযমের পানি উৎপন্ন

www.sunnibarta.com

হয়েছিল হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কদমের আঘাতে। এরপর আল্লাহ পাক বিবি মরিয়মকে লক্ষ্য করে বললেন-

"এই মৃত খেজুর গাছের শুষ্ক ডালকে নীচের দিকে টান দাও- তাহলে দেখবে- তা থেকে অকস্মাৎ পাকা তাজা খেজুর ঝরে পড়ছে" (সূরা মরিয়ম)।

এভাবে তাঁর কদমের নীচের পানি পান করে ও হাতের পরশের খেজুর খেয়ে প্রসব ব্যথা কমে গেলো এবং সহজে হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ট হলেন। **বুঝা গেল- বিবি মরিয়মের মত ওলীর কদমের ছোয়ায় গায়েবী পানি পাওয়া যায় এবং হাতের ছোয়ায় মরা বৃক্ষও জীবিত হয়ে ফলমূল দিতে পারে এবং সমূহ বিপদ ও কষ্ট লাঘব করতে পারে। তদ্রুপ ওলীগণের নজরে করমে মৃতবৎ আত্মা মারেফতের ফুলে ফলে সুসজ্জিত হতে পারে**। এটা হলেই ইলাহ্ হয়ে যায় না।

খ) হযরত জিবরাঈলের ঘোড়ার খুরের মাটি দ্বারা খড়ের তৈরী বাছুরের মূর্তি জীবিত হলোঃ

কোরআন মজিদ বলে- ফেরাউন নীল দরিয়ায় নিমজ্জিত হওয়ার দিন হযরত জিবরাঈল (আঃ) একটি মাদি ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন। জিবরাঈল (আঃ) মাদি ঘোড়াটি নিয়ে নীলনদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফেরাউনের মরদ ঘোড়া জিবরাঈলের মাদি ঘোড়ার লোভে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। জিবরাঈলের ঘোটকী শুকনো পথে নদী পার হয়ে গেলো- আর ফেরাউনের ঘোড়া মাঝ নদীতে আসার সাথে সাথে দুই দিক থেকে পানি পর্বতসমান উঁচু হয়ে এসে ফেরাউনকে সসৈন্যে ডুবিয়ে মারলো।

হযরত মূছা (আঃ) -এর সাথী যাদুকর সামেরী হযরত জিবরাঈলের ঘোটকীর পায়ের খুড়ার নীচের সামান্য মাটি কুড়িয়ে নিলো। সে দেখেছিল- উক্ত ঘোটকীর খুড়ের পরশে মৃত ঘাস সাথে সাথে জীবিত হয়ে যাচ্ছে। সে ধারনা করলো- নিশ্চয়ই উক্ত মাটিতে জীবনের তাছির রয়েছে। হযরত মূছা আলাইহিস সালাম যখন তৌরাত কিতাব গ্রহণ করার জন্য চল্লিশ দিনের

www.sunnibarta.com

চিল্লা নিয়ে তুর পর্বতে গমন করলেন -এই সুযোগে সামেরী খড় কুটা ও মাটি দিয়ে একটি বাছুরের মূর্তি তৈরী করে তার ভিতরে উক্ত ঘোটকীর খুড়ের কিছু মাটি ঢুকিয়ে দিলো। কি আশ্চর্য! সাথে সাথে উক্ত মূর্তিবাছুরটি জীবিত হয়ে গেলো। সামেরী হযরত মূছা (আঃ) -এর কওমের মধ্যে ঘোষণা করে দিলো- "এই বাছুরের ভিতরে খোদা লুকিয়ে আছে- তোমরা তার পূজা করো"। এভাবে অনেক লোক গো-পূজা শুরু করে দিলো। তখন থেকেই গো-পূজা শুরু হয়। হিন্দু জাতিরা তাই ভগবান জ্ঞানে গো-পূজা করে থাকে। সামেরীর এই গোবাছুর জীবিত করার ঘটনা কোরআন মজিদের সূরা তোয়াহা-তে আল্লাহ পাক কত সুন্দর করে বলেছেন-

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ-

অর্থাৎ- "সামেরী বললো- আমি জিবরাঈলের ঘোটকীর খুরের চিহ্নিত স্থান থেকে এক মুষ্ঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর তা এই মুর্তি বাছুরের মুখে ঢেলে দিলাম। আমার খবিছ অন্তর এভাবেই তা বলে দিয়েছিলো"। (সূরা তোয়াহা, ৯৬ আয়াত)।

উক্ত আয়াতের সারমর্ম হলো- "আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তগণের তাবাররুক বা বরকতময় বস্তু জীবনহীনকে জীবিত করতে পারে"। দেখুন! উক্ত মাটি ছিলো হযরত জিবরাঈলের ঘোটকীর খূরের তলার মাটি। ঐ মাটিতে প্রাণের তাছির কিভাবে আস্‌লো? হযরত জিবরাঈল (আঃ) -এর স্পর্শ থেকে ঐ তাছির এসেছিল। জিবরাঈল বসা ছিলেন কাঠের উপর। কাঠ লেগেছিল ঘোটকীর পিঠে, আর ঘোড়ার খুড় লেগেছিলো মাটির সাথে। সেই মাটি লেগেছিল মুর্তি বাছুরের মুখে। ঐ মাটিই বাছুরের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেছিল। মাটি তো মৃত বাছুরের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে দিলো- কিন্তু ঐ বাছুরের হাম্বা আওয়াজ মানুষকে হেদায়াত করতে পারেনি -বরং গোমরাহীর বীজ বপন করেছিল। তদ্রুপ বেদ্বীন আলেমের সারগর্ভ (?) ওয়াজের দ্বারাও মানুষ হেদায়াত প্রাপ্ত হয়না -বরং আরো বেশী গোমরাহ্ হয়ে

www.sunnibarta.com

যায়।

জিবরাঈলের ঘোড়ার খুড়ের মাটিতে যদি জীবনীশক্তি থাকে- তাহলে আল্লাহওয়ালাদের তাবাররুকে তাছির থাকবেনা কেন? দেখুন! মদিনা শরীফের মাটিকে "খাকে শেফা" বলা হয়। কেননা, উক্ত মাটি রোগ ও বালা মুসিবত বিদূরণকারী এবং আরোগ্যদানকারী। উক্ত মাটিতে এই তাছির কোথা থেকে আস্‌লো? যেহেতু মদিনা মোনাওয়ারার পবিত্র মাটি নবীজীর জুতা মোবারক চুমু খেয়েছিল, তাই তার মধ্যে এই তাছির এসেছে।

অতএব, মুসিবত দূর করাই যদি "ইলাহ্" হওয়ার শর্ত হয়- তাহলে খাকে শেফা এবং জিবরাঈলের ঘোড়ার খুড়ের মাটিও ইলাহ হওয়া উচিত। শুধু তাই নয় -বরং চিকিৎসকের টেবলেট ও সিরাপ, জঙ্গলের ঔষধিবৃক্ষ সমূহও ইলাহ হওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। বুঝা গেল- বিপদ দূরকারী, হাজত পূর্ণকারী ও সাহায্যকারী হলেই "ইলাহ্" হয় না- অথচ একশ্রেণীর নব্য ইসলামী চিন্তাবিদরা দাবী করছে- যিনি বিপদ দূর করেন, হাজত পূরণ করেন এবং সাহায্য করেন- একমাত্র তিনিই "ইলাহ্"। (নাউযুবিল্লাহ)।

৮। প্রসঙ্গ ঃ সৃষ্টি করা, মালিক হওয়া ও চিরস্থায়ী হওয়া "ইলাহ্" হওয়ার ভিত্তি নয়

মুসলমানদের মধ্যে কারো কারো ধারনা এই যে- "তিনিই ইলাহ্ বা আল্লাহ্- যিনি সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও চিরস্থায়ী। এসব গুণাবলী অন্য কারো মধ্যে নেই"। তাদের এ ধারণা ভুল। কেননা, সৃষ্টি করলেই খোদা হয়ে যায় না। মালিক হলেই "ইলাহ্" হতে হবে- এমন কোন কথা নেই। চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হলেই খোদা হয় না। এসব গুণাবলী তো অন্যের মধ্যেও আছে। তবে কি তারা ইলাহ্?

বুঝা গেল- এইসব গুণাবলীকে ইলাহ্ হওয়ার একমাত্র ভিত্তি বা পরিধি মনে

www.sunnibarta.com

করা সঠিক নয়। আল্লাহ পাক এসব গুণাবলীতে মৌলিকভাবে পূর্ণ গুণান্বিত- এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি এসব গুণাবলী তাঁর সৃষ্টি রাজীকেও দান করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই বলে তারা ইলাহ্ বা আল্লাহ্ হয়ে যান নি। যেমন-

ক) সৃষ্টি করা ঃ হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন-

اَنِّیۡ اَخۡلُقُ لَکُمۡ مِّنَ الطِّیۡنِ کَهَیۡـَٔةِ الطَّیۡرِ فَاَنۡفُخُ فِیۡهِ فَیَکُوۡنُ طَیۡرًا بِاِذۡنِ اللّٰهِ-

অর্থাৎ- "আমি মাটি দিয়ে পাখির সূরত সৃষ্টি করে তাতে ফুঁক দিলে সে আল্লাহর নির্দেশে জীবন্ত পাখী হয়ে যায়"। (সূরা আলে ইমরান, ৪৯ আয়াত)।

এখানে اخلق শব্দটির কর্তা হচ্ছেন ঈছা আলাইহিস সালাম। তিনি বলেছিলেন- **"আমি পাখি সৃষ্টি করতে পারি"**। সৃষ্টি করাই যদি খোদার একমাত্র পরিচয় হয়- তাহলে তো ঈছা আলাইহিস সালামও স্রষ্টা হয়ে খোদা সাব্যস্থ হন- নাউযুবিল্লাহ্। কোরআন মজিদে স্বয়ং আল্লাহই ঐ اخلق শব্দটি হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম -এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

খ) মালিক হওয়া ঃ মালিক হতে হলে তাঁর গোলাম বা সৃষ্টি থাকতে হয়। যখন কোন সৃষ্টিই ছিলনা- তখন আল্লাহর মালিকত্ব গুণের প্রকাশও ছিলনা। কিন্তু তখনও তিনি ইলাহ্ ছিলেন। মালিকত্ব প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তো মালিক বলা যায় না। বুঝা গেল- ইলাহ্ হওয়ার জন্য মালিক হওয়া জরুরী নয়।

গ) চিরস্থায়ী হওয়া ঃ আল্লাহ ছাড়াও চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী বস্তু এবং বান্দা রয়েছে। **বেহেস্তবাসীরা চিরস্থায়ী হবে এবং জান্নাতও চিরস্থায়ী। তাই বলে কি তারা ইলাহ?** আল্লাহ পাক বেহেস্তবাসীকে চিরস্থায়ী বলেছেন।

www.sunnibarta.com

যেমনঃ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا –

অর্থাৎ- “জান্নাতবাসীরা তথায় চিরস্থায়ী হবে”। (সূরা বাইয়েনাহ্)

তাওহীদপন্থী আলেমরা ওয়াযে বলে- “নেই কোন সৃষ্টিকর্তা- আল্লাহ ছাড়া”, “নেই কোন সন্তানদাতা- আল্লাহ ছাড়া”, “নেই কোন বিপদ দূরকারী- আল্লাহ ছাড়া”, “নেই কোন হাজতপূরনকারী- আল্লাহ ছাড়া”, “নেই কোন দাতা- আল্লাহ ছাড়া”।

একটি ঘটনা ঃ

এমন এক ওয়াযে এক হুযুরকে হাদীয়া দেননি আয়োজনকারীরা। হুযুর বাধ্য হয়ে হাদীয়া চাইলেন। তখন আয়োজনকারী বললেন- **আপনিই তো বলেছেন- “নেই কোন দাতা আল্লাহ ছাড়া”। এখন আমার কাছে চান কেন? একমাত্র দাতার কাছেই চান**। হুযুর তখন চুপ হয়ে গেলেন।

মূলকথা হলো- তারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কলেমার যেভাবে অর্থ করেন- তাকে অনেকটা অপব্যাখ্যাই বলা চলে। **ইলাহ্ শব্দের প্রকৃত অর্থ কী- তা এখন জানা দরকার। (৮-এর মধ্যেই ১০টি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে)।**

“ইলাহ্” শব্দের প্রকৃত ইসলামী অর্থঃ

এবার আসা যাক- কালেমার মধ্যে ইলাহ্ শব্দের প্রকৃত অর্থ কী? **ইলাহ্ শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে-** اَللّٰهُ الصَّمَدُ

“ইলাহ্ তিনি- যিনি বে-নিয়ায বা অমুখাপেক্ষী”। তিনি সর্ব ক্ষেত্রেই কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। ইল্‌মে, জ্ঞানে, গুণে, ক্ষমতায়, শক্তিতে, পরিচালনায়, প্রয়োজন পূরণে, বিপদ দূরীকরণে, কর্তৃত্বে, স্থায়ীত্বে- এক কথায় সর্ববিষয়ে তিনি অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ম্ভূ। আর এসব বিষয়ে বান্দা হচ্ছে সর্ব ক্ষেত্রে তাঁর মুখাপেক্ষী। সূরা ইখলাছে বলা হয়েছে-

www.sunnibarta.com

اَللّٰهُ الصَّمَدُ অর্থাৎ-" আল্লাহ সর্ব ক্ষেত্রে অমুখাপেক্ষী"।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ অর্থাৎ- আল্লাহ্ কারো পিতা নন এবং কারো পুত্রও নন- তিনি সর্ব মুক্ত।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ অর্থাৎ- "তাঁর কোন সমকক্ষ নেই"। তিনি অন্যের সমকক্ষতা থেকে মুক্ত। কেননা, তিনি ছাড়া সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি অভাবমুক্ত। অন্যরা অভাবগ্রস্ত। ইলাহ্ তিনিই- যিনি সর্ব বিষয়ে অসীম ক্ষমতার অধিকারী -অন্যরা সসীম ও আল্লাহ্ নির্ভরশীল। **সুতরাং সূরা ইখলাস হলো ইলাহ্ শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা।**

وَاللّٰهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

"আল্লাহ সৃষ্টিজগত থেকে বেনিয়ায"। সৃষ্টির কাছে তাঁর কিছুরই প্রয়োজন নেই।

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ -

অর্থাৎ-"আল্লাহ হচ্ছেন ধনী ও বে-নিয়ায- আর তোমরা হচ্ছো ফকির ও নিয়াযমন্দ"। কোরআন মজিদে আরো এরশাদ হয়েছে-

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلِيًّا مِّنَ الذُّلِّ -

অর্থাৎ- "আল্লাহ তায়ালা নিজ হীনতার কারণে কাউকে অভিভাবক বানান নি"।

এসব আয়াত হচ্ছে- ইলাহ্ হওয়ার সঠিক মাপকাঠি- যার ভিত্তিতে বান্দা বান্দা থাকে এবং প্রভূ প্রভূ থাকেন। **বে-নিয়াযী ও প্রয়োজনমুক্ত হওয়াই "ইলাহ্" হওয়ার মূল ভিত্তি।**

অন্যান্য সিফাতী নাম আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এককভাবে পার্থক্যকারী নয়। আল্লাহর অন্যান্য সিফাতী নাম বা গুণবাচক বিশেষ্য তাঁর পরিচয়ের একমাত্র ভিত্তি নয়। যেমন- কোরআন মজিদে আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- وَاللّٰهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

www.sunnibarta.com

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা"।

আবার বান্দার পরিচয় দিতে গিয়েও একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

অর্থাৎ- "আমি(আল্লাহ) মানুষকে দ্রষ্টা ও শ্রোতা বানিয়েছি"। দেখুন- سَمِيْعٌ-بَصِيْرٌ এই দুইটি সিফাতী নাম আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে- অর্থাৎ- আল্লাহ দ্রষ্টা ও শ্রোতা এবং বান্দাও দ্রষ্টা এবং শ্রোতা। তাই বলে কি আল্লাহর সাথে শির্ক হয়ে গেলো? শির্ক যদি হয়ে থাকে -তাহলে আল্লাহর কালামকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَالْحَيُّ الْقَيُّوْمُ–

"তিনিই ইলাহ্, তিনিই চিরজিন্দা, তিনিই চিরস্থায়ী"। আবার বান্দা সম্বন্ধেও একই حَيٌّ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন- بَلْ اَحْيَاءٌ "শহীদগণ মৃত নন -বরং জিন্দা"। এতদসত্বেও আল্লাহ আল্লাহই রয়েছেন এবং বান্দা বান্দাই থেকে যাচ্ছেন। পার্থক্য শুধু বে-নিয়াযী ও নিয়াযমন্দি- অসীম ও সসীম।

ছামিউন, বাছিরুন, হাইয়ুন- ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হওয়া স্বত্ত্বেও বান্দা ইলাহ্ হতে পারবেনা। কেননা, তারা বে-নেয়ায বা অমুখাপেক্ষী নয়। তারা আল্লাহর মুখাপেক্ষী ও নিয়াযমন্দ। **আল্লাহর উলুহিয়াত ও বান্দার আবদিয়াতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয় হচ্ছে- হাকিকী ও মাজাযী, স্বত্বাগত এবং আল্লাহ প্রদত্ত**। এই পার্থক্য অনেকেই জানে না। জানলেও বলে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- একই রেললাইনের উপর ইঞ্জিনও চলে এবং বগীও চলে। ইঞ্জিল চলে নিজ শক্তিতে- আর বগী চলে ইঞ্জিনের শক্তিতে। উভয়ই চলমান- কিন্তু ক্ষমতার ক্ষেত্রে ব্যবধান। তদ্রুপ- হাজতপূর্ণকারী, বিপদ দূরকারী, শেফা দানকারী, সন্তান দানকারী, বিশ্বজগতে কর্তৃত্বকারী,

www.sunnibarta.com

দূর থেকে শ্রবণকারী- ইত্যাদি হাকিকী অর্থে আল্লাহ- কিন্তু মাজাযী অর্থে বান্দাও হতে পারে। বান্দা এসব গুণের অধিকারী হন অছিলা হিসাবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে। নবীগণের বেলায় এগুলোকে বলা হয় মোজেযা এবং অলীগণের বেলায় বলা হয় কারামত। সাধারণ মানুষের বেলায় বলা হয় মাজাযী। তাই বলে কি নবী ও অলীগণ ইলাহ্ হয়ে যান? না- তা কখনও হতে পারে না। নবীগণ এবং অলীগণ কখনও এমন দাবী করেন নি এবং করতেও পারেন না।

দেওবন্দী ওহাবীপন্থী ওলামাগণের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব তাঁর "যিয়াউল কুলুব" নামক তাসাউফ গ্রন্থের ২৯ ও ৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

"ফানা ফিল্লাহর মাকামে পৌঁছলে বান্দার মধ্যে খোদা প্রদত্ত বাতেনী শক্তি এসে যায়"। এটাকে তিনি খোদায়ী শক্তি বলেছেন। তিনি আরো লিখেছেন- "এমতাবস্থায় আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকেনা। তখন আল্লাহওয়ালা খাস বান্দা সৃষ্টি জগতে কর্তৃত্ব করতেও পারেন"। (যিয়াউল কুলুব- ফানা-র বর্ণনা অধ্যায়)।

আল্লাহর এসব বান্দা তখন মাজাযী অর্থে বা উছিলা অর্থে সন্তান দানকারী, হাজতপূরণকারী, বিপদ দূরকারী, শেফা দানকারী, দূর থেকে শ্রবণকারী- ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হয়ে যান। তাই যারা ঐসব গুণাবলীকে একমাত্র ইলাহ্-র মানদন্ড সাব্যস্থ করেছেন- তারা মূলতঃ হাজার খোদাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এটা তাদের শেরেকী ধ্যান ধারনা।

আল্লাহ পাক-ই নবী ও অলীগণকে আপন যাত ও সিফাতের প্রকাশস্থল বানিয়েছেন। তাঁদের কর্মকান্ডের মাধ্যমেই আল্লাহর অসীম ক্ষমতা প্রকাশ পায়। আল্লাহর রহিমী সিফাত, নূরী সিফাত, কিব্‌রিয়ায়ী সিফাত, ক্ষমতা প্রয়োগকারী সিফাত, দূর হতে দেখা ও শুনার সিফাত- ইত্যাদি আমাদের প্রিয় নবীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তাই কুরআন মজিদে তাঁকে রাহিমুন, নূরুন, ছামীউন, বাছিরুন, শাহিদুন- ইত্যাদি সিফাতী নামে ভূষিত

www.sunnibarta.com

করেছেন। তাই বলে কি প্রিয় নবীজি খোদা বা ইলাহ্ হয়ে গেছেন? নাউযুবিল্লাহ! রাহিমুন হওয়াই যদি ইলাহ্ হওয়ার মানদন্ড হয়- তাহলে আল্লাহর রাছুলকে কি বলবেন? নবীজির নামও তো রাউফুন- রাহিমুন। এই নাম তো আল্লাহ প্রদত্ত (সূরা তওবা)। কিন্তু দুই রাহীম শব্দের অর্থের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

আর একটি উদাহরণ- আগুনের মধ্যে লোহার দা ঢুকিয়ে দিলে কিছুক্ষণ পর লোহাটি আগুনের রূপ ধারণ করে এবং আগুনের মতই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। দহন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তখন কি দা আগুন হয়ে যায়? না- আগুন হয় না, কিন্তু আগুনের গুণের সাময়িক অধিকারী হয়ে যায়। ইলাহ্ ও বান্দার উদাহরণও তদ্রুপ। আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হতে পারলে তাঁর মধ্যেও খোদায়ী সিফাত প্রকাশ পায়। তাই বলে বান্দা কখনও মাবুদ হয়ে যায় না। **যারা ইহাকে শির্ক মনে করে- তারাই মূলতঃ মুশরিক**। কারণ তাদের ধারণা মতে এসব গুণের অধিকারীকেই ইলাহ্ বা আল্লাহ বলা হয়। তারা কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ, হাকিকত ও মাজায সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, বালাগাত বা অলঙ্কার শাস্ত্র সম্পর্কে এরা একেবারেই মূর্খ।

ফিকাহ্ শাস্ত্র মতে ফতোয়া দিতে হলে হাকীকত ও মাজায সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। উরফ, আদত বা দেশাচার ও জনগনের পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হবে। **এসব এলেম ও জ্ঞানের অভাবেই এরা কথায় কথায় শির্ক ও বিদআত বলে ফেলে। জনগণ তলিয়ে দেখেনা যে, শির্ক ও বিদআত বলে মূলতঃ জনগণকেই মুশরিক বানাচ্ছে।**

মুসলমানকে মুশরিক বানাতে শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে বলে নবীজি ইরশাদ করে গেছেন (বুখারী)। কাজেই আল্লাহর কুদরত, নবীগণের মোজেযা এবং অলীগণের কারামত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। নতুবা ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। **ফল কথা- আল্লাহ হলেন মূল ও স্বত্তাগত গুণের অধিকারী এবং বান্দা হলো আল্লাহ প্রদত্ত গুণের অধিকারী।**

www.sunnibarta.com

এ জন্যই বোখারী শরীফে অলী আল্লাহ্‌দের সম্পর্কে আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেন-

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يَبْصُرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّذِيْ يَأْخُذُ بِهِ وَرِجْلَيْهِ الَّذَيْنِ يَمْشِيْ بِهِمَا- وَاِذَا سَأَلَنِيْ لَاُعْطِيَنَّهُ (بُخَارِيٌّ)

অর্থঃ "নফল ইবাদতের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে বান্দা আমার বন্ধু হয়ে যায়। তখন আমি তার চোখ, কান, মুখ, হাত, পা হয়ে যাই- যদ্বারা সে দেখে, শুনে, ধরে এবং চলে। আর- যখন সে আমার কাছে কিছু চায়, আমি অবশ্য অবশ্যই তা দিই" (বুখারী)।

এ হাদীসের অর্থ এ নয় যে- আল্লাহ তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন এবং আল্লাহ ও বান্দা একাকার হয়ে গেছে -বরং এর মর্মবানী হচ্ছে- আল্লাহর তাজাল্লীয়ে রাব্বানী যখন বান্দার উপর পতিত হয়- তখন বান্দা থেকে খোদায়ী কাজ প্রকাশিত হতে থাকে। তখন বান্দা খোদায়ী শক্তির প্রকাশস্থল হয়ে যায়। তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ নিজ শক্তি প্রকাশ করেন। এটাকে ফানা ফিল্লাহর মাকাম বলা হয়।

একটি জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর ঃ

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বিরুদ্ধবাদীরা সন্দেহ সৃষ্টির লক্ষ্যে একথা বলতে পারে যে- যদি বে-নেয়াযীই ইলাহ্-র একমাত্র মাপকাঠি হয়- তাহলে আরবের মুশরিকরাও তো তাদের দেবদেবীদেরকে বে-নিয়ায মনে করতো না -বরং আল্লাহর মুখাপেক্ষীই মনে করতো। এতদসত্বেও তাদের দেবদেবীদেরকে কেন ইলাহ্ বলা হলো এবং তাদেরকেই বা কেন মুশরিক বলা হলো?

দেবদেবী সম্পর্কে তাদের আক্বিদা ও বিশ্বাস ছিল- "আমাদের মাবুদ সমূহ

www.sunnibarta.com

(দেবদেবী) অদৃশ্য জ্ঞানী, সর্বত্র বিরাজমান, দূর হতে শ্রবণকারী,হাজত পূরণকারী, বিপদ দূরকারী ও ফরিয়াদ গ্রহণকারী"। এসব আক্বিদার কারণেই তারা মুশরিক বলে সাব্যস্থ হয়েছে- কারণ এসব গুণাবলী উলুহিয়তের পরিধিভুক্ত। যে বান্দার মধ্যে এসব গুণাবলী মানা হয়- তাকে খোদা বলেই স্বীকার করা হয়। মুশরিকরা এসব গুণাবলী তাদের দেবদেবীর মধ্যে আরোপ করে মুশরিক হয়েছে। আজকের মুসলমানরাও নবী এবং অলীগণের মধ্যে ঐসব গুণাবলী স্বীকার করে মুশরিক হবে না- কেন? তারা তো তাদের পীর বুযুর্গ এবং নবীকে এসব গুণাবলীর অধিকারী দাবী করে প্রকৃতপক্ষে ইলাহ্ বলেই স্বীকার করে নিচ্ছে। সুতরাং এই আক্বিদা শিরিকী আক্বিদা।

জবাব ঃ

ওহাবীপন্থী ও মউদূদী পন্থীদের এটা চূড়ান্ত আঘাত- যার উপর ভিত্তি করে তারা সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করছে এবং তাদেরকে মুশরিক বলে বিভিন্ন মাহফিলে বক্তব্য রাখছে। তাদের এই বিভ্রান্তির জবাব হচ্ছে-

"শিরক হচ্ছে- কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা বরাবর স্বীকার করা"। যেমন, কোরআন মজিদে কাফেরদের ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে-

ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ -

অর্থাৎ- "কাফেররা বান্দাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করে"।

অন্য আয়াতে এরশাদ হচ্ছে- اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ- "কিয়ামত দিবসে কাফেররা স্বীয় উপাস্য দেব- দেবীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে- "আমরা তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীন -এর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করতাম"। -বুঝা গেল যে, কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করাই শিরক। মুশরিকরা তাই মনে করতো। কোন মুসলমানই এরূপ মনে করেনা।

www.sunnibarta.com

সমকক্ষতা দুই ভাবে হতে পারে। (এক) সৃষ্টিকে আল্লাহর ন্যায় সমকক্ষ স্থান দিয়ে স্বত্বাগতভাবে (যাতি) সৃষ্টিকর্তা, মালিক, অদৃশ্যজ্ঞানী, রক্ষক, সর্বত্র বিরাজমান- ইত্যাদি মনে করা। (দুই) মহান আল্লাহর শান ক্ষুন্ন করে বান্দার সমান মনে করা এবং এ কথা বিশ্বাস করা যে, কিছু জিনিসের জন্য বান্দা আল্লাহর মুখাপেক্ষী- আর কিছু জিনিসের জন্য আল্লাহ বান্দার মুখাপেক্ষী। **এই দুই অবস্থায় বান্দাকে আল্লাহর বরাবর মনে করার নাম শিরিক। আরবের কাফিরগণ এই দুই প্রকারের শিরিকেই লিপ্ত ছিল। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীদের দাবী ঠিক নয়।**

একদল বলতো- ভাল ও মন্দের স্রষ্ঠা দুইজন। ভাল- এর স্রষ্ঠার নাম "ইয়াজদান" এবং মন্দ -এর স্রষ্ঠার নাম "আহরেমান"। উভয় স্রষ্ঠাই সমকক্ষ। হিন্দুরা মানে তিন স্বত্বা- যথাঃ ব্রম্ম, বিষ্ণু ও শিব। ব্রম্ম হলেন স্রষ্ঠা, বিষ্ণু হলেন পালনকর্তা এবং শিব হলেন সংহারকর্তা। আরবের একদল মুশরিক বলতো- ফিরিস্তা ও দেবদেবীরা আল্লাহর পুত্র সন্তান। আর একদল বলতো- দেবদেবীরা আল্লাহর কন্যাসন্তান। এসব মুশরিকরা দেবদেবীদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করেই বিপদ দূরকারী, হাজত পূর্ণকারী- ইত্যাদি "সত্ত্বাগত সমকক্ষ" হওয়ার আক্বিদা পোষণ করার কারণেই মুশরিক হয়েছে।

আর একদল বলতো- আমাদের দেবদেবী ও মূর্তিগুলো আল্লাহর বান্দা বটে- কিন্তু মহান প্রভূ তাদের মুখাপেক্ষী। মহান প্রভু বিশ্বভূমন্ডল সৃষ্টি করে এতবেশী দূর্বল ও কাহিল হয়ে পড়েছেন যে, দুনিয়ার পরিচালনা ও এন্তেযাম নিজ আয়ত্বে রাখতে অক্ষম। তাই আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের উপর পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তারাই এখানকার কাজকর্ম চালাচ্ছেন। তাদের এই আক্বিদা হচ্ছে শিরক। তারা আল্লাহকে বে-নিয়ায মনে করছেনা। তাদের মতে আল্লাহ পরনির্ভরশীল এবং তাদের দেবদেবীরা আল্লাহর সমকক্ষ ক্ষমতার অধিকারী। তাদের শিরিকের ইহাই মূল কারণ। তাদের মতবাদ খন্ডন করে আল্লাহ্ পাক

www.sunnibarta.com

এরশাদ করেছেন- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ "তিনি কারো পিতা নন এবং সন্তানও নন"। আরো এরশাদ করেন- وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ

অর্থাৎ-"জগত সৃষ্টি ও পালনের ক্ষেত্রে আমাকে দূর্বলতা স্পর্শ করতে পারেনি"। অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন-

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلِيًّا مِّنَ الذُّلِّ -

অর্থাৎ- "আল্লাহ তায়ালা অসহায় ও দূর্বল হয়ে কাউকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেন নি"। **উপরে উল্লেখিত আক্বিদার কারণেই তাদেরকে মুশরিক বলা হয়েছে।**

আলহামদু লিল্লাহ! কোন মুসলমান এরূপ জঘণ্য আক্বিদা পোষণ করেনা। আল্লাহর প্রিয় নবীকে আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েবের অধিকারী স্বীকার করা, কোন মাহবুব বান্দাকে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সৃষ্টির রক্ষক, বিপদ দূরকারী, হাজতপূর্ণকারী- ইত্যাদি মনে করা শিরিকও নয়- কুফরীও নয়। মুসলমানের আক্বিদা হচ্ছে আল্লাহনির্ভর এবং মুশরিকদের আক্বিদা হচ্ছে স্বনির্ভর। উভয়ের আক্বিদার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

যারা মুসলমানদের আক্বিদাকে মুশরিকদের আক্বিদার সাথে তুলনা করে- তারাই বরং মুশরিক। কেননা, তারা বান্দাকে খোদার সমকক্ষ বানিয়ে ফতোয়াবাজী করে। ইসলামী আইন ব্যাখ্যা করলে তারা এরূপ বলতে পারতো না। কাফের ও মুশরিকদের শানে নাযিলকৃত আয়াতকে তারা অলী আল্লাহ্দের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। তারা কোরআনের অপব্যাখ্যাকারী।

সাহাবাগণ রাসুল (দঃ)কে কেমন মনে করতেন?

(১) এখন দেখা যাক- সাহাবায়ে কেরাম রাসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেমন মনে করতেন? তাঁরা রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাঁদের হাজত পূরণকারী, বিপদ দূরকারী ও রক্ষক বলে বিশ্বাস করতেন। যখন তাঁদের

www.sunnibarta.com

কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যেতো- তখন নবীজীর দরবারে এসে আরয করতেন- طَهِّرْنِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

অর্থাৎ- "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পাক পবিত্র করে দিন"।

তাঁরা কেন একথা বলতেন? তাঁরা স্বয়ং কুরআন মজিদে দেখেছেন, আল্লাহ পাক বলছেন- وَيُزَكِّيْهِمْ "আমার প্রিয় হাবীব তাদের অপবিত্রতা দূর করেন" (সূরা বাকারা, ১২৯ আয়াত)। এই অপবিত্রতা দূরকারী ও পবিত্রকারী হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্পাক তাঁকে মুযাক্কী বা পবিত্রকারী খেতাবে ভূষিত করেছেন।

(২) আরও দেখুন- সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের সমস্ত ধন-সম্পদ দান ও সদকা করার মানসে হুযুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দরবারে হাযির হলে আল্লাহ পাক উক্ত সদকা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করে এরশাদ করেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ-

"হে আমার হাবীব! আপনি তাদের মালের সদকা গ্রহণ করুন এবং এর মাধ্যমে তাদের যাহের বাতেন পবিত্র করুন এবং তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করুন- নিশ্চয়ই আপনার রহমত কামনা তাদের মনের প্রশান্তি এনে দিবে" (সূরা তাওবা, ১০৩ আয়াত)।

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো- শুধু নামায, রোযা ও কোরআন হাদীস আমাদেরকে পাক পবিত্র করতে পারেনা- যতক্ষণ না মাহ্বুবে খোদার সুদৃষ্টি হয়। কোরআন হাদীস হচ্ছে সাবান ও পানি স্বরূপ- আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দোয়া, দয়া ও রূহানী সাহায্য হচ্ছে পরিপূর্ণ পবিত্রতার উছিলা। শুধু সাবান আর পানি দিয়ে কাপড় পরিপূর্ণ

www.sunnibarta.com

সাফ হয় না- হাতও লাগাতে হয়। নবীজির নজরে করম হচ্ছে পরিপূর্ণ পবিত্রতার উছিলা।

(৩) আরও দেখুন- অন্ধরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শরনাপন্ন হয়ে দৃষ্টি শক্তি প্রার্থনা করেছেন, মৃগ রোগীরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরোগ্য প্রার্থনা করেছেন, উস্তুনে হান্নানা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জান্নাত প্রার্থনা করেছিল। খাদেম সাহাবী হযরত রাবিয়া ইবনে কা'ব (রাঃ) হুযুরের নিকট জান্নাতে তাঁর সান্নিধ্য প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু দোজাহানের শাহিনশাহ একথা বলেন নি যে, শেফা দানকারী, দৃষ্টিশক্তি দানকারী, জান্নাত দানকারী একমাত্র আল্লাহ- আমি কিভাবে দেবো? বরঞ্চ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সে হাজত পূরণ করেছেন। বুঝা গেল- খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাহিদা ও হাজত পূরণ করে থাকেন। যদি নবীজিকে ইলমে গায়েবের অধিকারী স্বীকার করা, রক্ষক মনে করা, বিপদ দূরকারী ও হাজত পূরনকারী মনে করা শিরিক হয়- তাহলে সাহাবায়ে কেরাম সবাই মুশরিক হয়ে যেতেন- (নাউযুবিল্লাহ!)

আম্বিয়ায়ে কেরামের খোদাপ্রদত্ত ইলমে গায়েব, হাযির নাযির, মুশকিল-কোশা, হাজাত রাওয়া- ইত্যাদি এমন সুষ্পষ্ট বিষয়- যা এ যুগের কাফিররাও অস্বীকার করতে পারবে না- অথচ মুসলমান নামধারী কিছু সংখ্যক তা অস্বীকার করছে।

(৪) দেখুন- বিপদে আপদে নবীর কাছে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করার কথা কোরআন মজিদে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন ফিরাউন ও তার অনুসারীদের উপর আল্লাহর কোন গযব নেমে আসতো- তখন ফিরাউন হযরত মূছা (আঃ)-এর নিকট গিয়ে এভাবে প্রার্থনা করতো-

لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْ اِسْرَا ئِيْلَ-

www.sunnibarta.com

অর্থাৎ- "হে মূছা! আপনি যদি এবার আমাদের উপর থেকে খোদায়ী আযাব দূর করে দিতে পারেন- তাহলে আমরা অবশ্যই আপনার উপর ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকে আপনার সাথে পাঠিয়ে দেবো"। (সূরা আ'রাফ, ১৩৪ আয়াত)।

দেখুন! আল্লাহ বা মূছা আলাইহিস সালাম নবীর কাছে তাদের এই ফরিয়াদ ও প্রার্থনাকে শিরিক বলেন নি -বরং মূছা (আঃ) দোয়ার মাধ্যমে তাদের বিপদ দূর করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের এই প্রার্থনা যদি শিরিক হতো- তাহলে বিপদ দূর না করে ডাবল আযাবের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় ছিল।

আল্লাহ বলেন কী- আর ওহাবী মোল্লা বলে কী!

পরিতাপের বিষয়- এ যুগের কিছু কলেমাগো তথাকথিত বাতিলপন্থী মৌলভীরা নবীদের নিকট বিপদ দূর করার প্রার্থনাকে শিরিক বলে বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে।

সার কথা হলো- হাজত পূরন, বিপদ দূরীকরণ, রোগ থেকে মূক্ত করন- এগুলো মৌলিকও স্বত্বাগতভাবে আল্লাহর কাজ এবং উছিলা হিসাবে নবী, রাসুল ও অলী আল্লাহগণের কাজ। **এই মাসআলার সূত্র ও ভিত্তি হচ্ছে হাকীকত ও মাজাযের উপর। আলেম মাত্রই হাকীকত ও মাযাযের মাসআলা সম্পর্কে অবগত আছেন।** এটা না বুঝা পর্যন্ত ঈমানই সঠিক হবে না। সত্যপথ অনুসরণ করাই বিবেকবানের কাজ।